International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

সুন্দরবন অঞ্চলের লুপ্তপ্রায় কিছু লোকসংগীত

ড. মিলনকান্তি বিশ্বাস
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (বাংলা বিভাগ)
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

ভৌগোলিক দিক থেকে সুন্দরবন অঞ্চল বলতে পশ্চিমবঙ্গের এবং পূর্ববঙ্গের কিছু দক্ষিণ অঞ্চলকে বোঝায়। এই উভয় বঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিত সুন্দরবন। নদীনালার দেশ কিংবা ভাটিয়া দেশ বলা হয় সুন্দরবন অঞ্চলকে। চারিদিকে নদী দ্বারা বেষ্টিত বলে এই অঞ্চলকে দ্বীপ অঞ্চলও বলা হয়ে থাকে।

বর্তমানে সুন্দরবনের ৫৪টি দ্বীপে লোক বসবাস করেন। জনসংখ্যা ৫৪ লক্ষেরও বেশি। অবশিষ্ট দ্বীপগুলিতে বন্যপ্রাণী এবং ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। একদিকে ভয়াল-ভয়ংঙ্কর জীবজন্তুর উৎপাত অন্যদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ হাতছানি। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণকে মুখের কথায় নিচু বাংলা, আবাদ, লাট, দখনে, বাদা, সাগর বলাও হয়। সুন্দরবন মূলত পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, বাসন্তী, গোসাবা, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, ন্যাজাট, কালীনগর, সন্দেশখালি, বসিরহাট প্রভৃতি থানা দিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলের মানুষদের জলে কুমীর আর ডাঙ্গায় বাঘ-সাপের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়।

নানা সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস এই সুন্দরবন অঞ্চলে। মূলত পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে নানা সম্প্রদায়ের মানুষ এসে বসবাস স্থাপন করেছেন। এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। এছাড়াও মাছ ধরা, বন থেকে মধু সংগ্রহ করা প্রভৃতি পেশায় কিছু মানুষ জীবন নির্বাহ করেন। সেই জন্য এই অঞ্চলে মনসার গান কিংবা বা পাঁচিল, শীতলার গান বা পাঁচালী, বনবিবির গান যেমন জনপ্রিয় তেমনি কৃষিকেন্দ্রিক কিছু লোকানুষ্ঠান ও লোকসংগীতও এক সময় এই অঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আজ সেই সব লোকানুষ্ঠান ও লোকসংগীত সবই প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমান প্রজন্মের মানুষের কাছে এগুলি অজ্ঞাত থেকে গেছে। এখন এগুলি সংগ্রহ করা প্রায় দুঃসাধ্য।

লোকসংগীত বলতে এক কথায় লোকজীবনের গানকে বোঝায়। আদিম সংগীত ক্রমেই লোকসংগীত রূপে বিবর্তিত হয়েছে। লোকসংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পরম্পরাগত ভাষা ও সুরের ঐতিহ্যের অবলম্বন। লোকসংগীতের উৎস গ্রামীণ

জল, হাওয়া, মাটি আর লোকায়ত সহজ-সরল হৃদয়। জীবনের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও প্রত্যাশা পূরণই এর লক্ষ্য। এই লোকসংগীতগুলি লোকায়ত মানুষের শ্রম, আচার-অনুষ্ঠান ও জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। লোকায়ত মানুষের চেতনার অভিব্যক্তি ঘটেছে এই লোকসংগীতে। এ কারণে লোকসংগীত হল লোকায়ত মানুষের জীবনের দলিল। উভয়বঙ্গের (পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ) লোকসংগীতের ধারা যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি সমৃদ্ধশালী। পৃথিবীর আর কোনো দেশের লোকসংগীত এতো বৈচিত্রপূর্ণ এবং সমৃদ্ধশালী কিনাসন্দেহ!

এক

সুন্দরবন অঞ্চলের একটি অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া লোকসংগীত হল মা-লক্ষ্মীর বিয়ের গান। কার্তিক মাসে নতুন চাঁদ দেখে এই অনুষ্ঠান করা হয়। এটি মূলত কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান। ভালো ফসল কামনার্থে এই অনুষ্ঠান করা হয়। এই সময় মাঠে ধানের থোড় থেকে শিষ বের হয়। ফসলের এই পর্যায়কে বরণ করে নেওয়ার অনুষ্ঠানকে বলা হয় মা-লক্ষ্মীর বে (< বিয়ে < বিবাহ) দেওয়া। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে গান গীত হয় তাকে বলা হয় মা-লক্ষ্মীর বিয়ের গান।

নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী, প্রবীণ-প্রবীণা সকলেই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। কার্তিক মাসে নতুন চাঁদ দেখার পর বাড়ির বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা মেয়েরা একটা কুলোয় করে ছোট্ট জলপূর্ণ ঘট, ঘটে একটা আমের পল্লব বা আমশাখা, ঘটের গায়ে সিঁদুর দিয়ে আঁকা লক্ষ্মীর চিত্র, একটি প্রদীপ, ধান, দূর্বা, সরষে, আমের পাতায় বা কলা পাতায় একটু সিঁদুর ও চন্দন প্রভৃতি নিয়ে নিজ নিজ জমির প্রান্তে উপস্থিত হন। এছাড়াও আরও প্রয়োজন হয় পনেরো-কড়ি হাত লম্বা একটি বাঁশ। বাঁশের মাথায় দড়ি দিয়ে আধ ভেজা খড় বা পাটকাঠি বেঁধে মশাল তৈরি করা হয়। আধভেজা কেন সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

মেয়েরা প্রদীপ, ধান, দূর্বা প্রভৃতি দিয়ে ধান গাছকে বরণ করে নেন। বরণ করার সময় শাঁখ, ঘন্টা বাজানো হয়। এই বরণ-পর্ব শেষ হলে পরে মশালটি প্রদীপের আলোয় জ্বালানো হয়। মশালটির একদিক মাটিতে পায়ের কাছে রেখে দুই হাত দিয়ে ধরে বাম দিক থেকে ডান দিকে এবং অনুরূপভাবে ডান দিক থেকে বাম দিকে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো নাড়াতে থাকেন এবং সমবেত কণ্ঠে গান করেন—

'আশ্বিন গ্যালো[১] কার্তিক আলো[২]
মা লোক্‌খী গরবে[৩] বুস্‌লো

মা লোক্‌খী গো—
অ্যাক[৪] গোলা ধান দিওগো—
ওগো[৫] বিলে[৬] কুলো নাড়া[৭]
আমাগো বিলে কুলো ঝাড়া[৮]
মা লোক্‌খী গো—
বায়ান্ন কোটী ধান দিও গো—'।

(১. গেল, ২. এলো, ৩. গর্ভে, ৪. এক, ৫. অন্যের, ৬. চাষের জমিতে, ৭. ধান না হওয়া বা শুধুই খড় হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ৮. অধিক পরিমাণে ধান বা ফসল হওয়া)।

মশালটি একটু স্যাঁতসেতে কিংবা একটু ভিজে ভিজে হলে অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে। যদি খড় বা পাটকাঠি শুকনো হয়, তবে তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়। যত বেশি সময় ধরে জ্বলবে তত বেশি পোকামাকড় মরবে। এই কারণে মশালের খড় বা পাটকাঠি একটু স্যাঁতসেতে হলে ভালো। গানটি প্রলম্বিত সুরে গাওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে গানটি গাওয়া হয়। গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবার একই দিনে একই সময়ে নিজ নিজ জমিতে এই মা-লক্ষ্মীর বিয়ে অনুষ্ঠান পালন করেন। এখন অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক গান অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

পোশাক-আশাক পরিয়ে একজন বালিকা ও একজন বালককে লক্ষ্মী ও নারায়ণ সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে লক্ষ্মী ও নারায়ণকে কোলে করে বাড়িতে এনে ধানের গোলার সামনে পিঁড়ির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে দিয়ে ধানের গোলাকে প্রণাম করানো হয়। সব শেষে উপস্থিত সবার হাতে খই মুড়ি বাতাসা দেওয়া হয়।

এই অনুষ্ঠান এক সময় সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতো বলে জানা যায়। ফলে এর মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুর ধ্বনিত হতে দেখা যায়। এই অসাম্প্রদায়িক ভাবনা লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

একটু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে লোকায়ত সমাজের প্রচলিত অনুষ্ঠানদির মধ্যে কিছু বিজ্ঞান মনস্কতারপরিচয় পাওয়া যায়। উপরিউক্ত অনুষ্ঠানের মধ্যেই লোকায়ত মানুষের বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। আশ্বিন মাসে যখন ধানের শিষ বের হয় তখন নানা পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হওয়ার সম্ভবনা থাকে। লক্ষ্মীর বিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে যে মশাল জ্বালানো হয় সেই মশালের আগুনে সমস্ত পোকা-মাকড় পুড়ে মারা যায়। ফলে ধানের ফসল ভালো হয়। প্রত্যেক

পরিবার তাঁদের নিজ নিজ জমিতে গিয়ে মা-লক্ষ্মীর বিয়ে দেন। বর্তমানে এই অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই গান সবই প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে।

দুই

গ্রাম-বাংলার অবলুপ্তপ্রায় লোকসংগীতগুলির মধ্যে অন্যতম লোকসংগীত হল ধান ভানার গীত। এক সময় গ্রাম-বাংলার ধান থেকে চাল তৈরি করার একমাত্র উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হতো ঢেঁকি। ঢেঁকিকে লোকযন্ত্র বলা হয়। বর্তমানে গ্রাম-বাংলা থেকে এই ঢেঁকি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ঢেঁকির স্থান দখল করেছে ধান থেকে চাল তৈরির মেশিন। এখন সর্বত্রই প্রায় মেশিনের সাহায্যে ধান থেকে চাল তৈরি করা হয়। একসময় বহু মানুষ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন এবং এই কাজ করে জীবন নির্বাহ করতেন। যাঁরা চালের কারবার করতেন তাঁরা গ্রাম থেকে ধান কিনে সেই ধান বাড়িতে সেদ্ধ করে শুকিয়ে ঢেঁকিতে চাল তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতেন। এই পেশাকে বলা হতো চাল্‌কো। এই চাল তৈরির কাজ মেয়েরাই করতেন। চাল তৈরির কাজে পুরুষেরা অংশগ্রহণ করেতেন না। কমপক্ষে তিনজন মহিলার প্রয়োজন হত এই কাজে। দুজন ঢেঁকিতে পার (পা দিয়ে ঢেঁকির পেছনের দিকে চাপ দিলে মাথার দিক উঁচু হয় এবং পা সরিয়ে নিলে মাথাটি জোরে গড়ে পড়ে) দেন এবং একজন গড়ে'র ধান হাত দিয়ে নেড়ে দেন। ঢেঁকির ওঠা ও নামার ফাঁকে এই কাজ করতে হয়। কোন কারণে অন্য মনস্ক হলে কিংবা ছন্দপতন হলে হাতে ঢেঁকি পড়তে বাধ্য। আর হাতে ঢেঁকি পড়ার অর্থ সমস্ত হাতের হাড় কুচি কুচি হয়ে হাতটি দলা পাকিয়ে মাংস পিণ্ডতে পরিণত হওয়া।

ঢেঁকিতে পার দিতে দিতে তাঁরা গান করেন—

'ও ধান ভানো রে ভানো রে—
ঢেঁকিতে পার দিয়া,
ও ধান ভানো রে—
ঢেঁকি নাচে আমি নাচি
হেলিয়া দুলিয়া
ও ধান ভানো রে—'।

গানটি দ্রুত লয়ে গীত হয়। ঢেঁকি যেহেতু দ্রুত তালে ওঠা-নামা করে সেহেতু ধান ভানার গীত দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। বর্তমানে ঢেঁকি অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ধান ভানার গীতও অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

তিন

লোকানুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হল নৌকা বাইচ। বর্তমানে এটিও অবলুপ্তপ্রায়। মনসা পুজো উপলক্ষ্যে কিংবা নদীতে নৌকা বাইচ হয়। বহু নৌকা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ছেলেদের নৌকাবাইচ ও মেয়েদের নৌকা বাইচ স্বতন্ত্রভাবে হয়। বাইচের নৌকা বেশ লম্বা হয়। চওড়ায় সরু হয়। এক একটি নৌকায় একসঙ্গে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। নৌকার গায়ে নানা লতা-পাতা, ময়ূর, সাপের চিত্র আঁকা হয়। লোকসংস্কৃতির ভাষায় এগুলিকে মোটিফ (Motif) বলে। এই মোটিফগুলির মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিটি বাইচের নৌকায় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে কাঁসি থাকে। গান ও কাঁসির বাজনার তালে তালে বইঠা পড়ে। বাইচে যে নৌকা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয় সেইসব নৌকাকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় গোরু, পিতলের কলসি, হাতঘড়ি, সাইকেল প্রভৃতি।

নৌকা বাইচের সময় যে গান করা হয় তাকে সারি বলা হয়, গ্রাম-বাংলার একটি প্রায় অবলুপ্তপ্রায় লোকসংগীত হল সারি। নৌকা বাইচের সময় এই গান গীত হয় তাই সারিকে বলা হয় জলের গান। বাইচের নৌকায় যতজন অংশগ্রহণ করেন সবাই একই সঙ্গে এই গান করেন, তাই দলবদ্ধভাবে এই সংগীত গীত হয়। দলবদ্ধভাবে নৃত্য ও গীত পরিবেশন প্রায় সব লোকসংগীতেরই অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। নৌকার বৈঠা যেহেতু দ্রুত তালে পড়ে তাই এই গান দ্রুত লয়ে গীত হয়। পশ্চিমবঙ্গের থেকে পূর্ববঙ্গে এই গানের প্রচলন সবথেকে বেশি।

সুন্দরবন অঞ্চলের নৌকা বাইচের গান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। পূর্ববঙ্গের কয়েকটি সারি গানের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল। গানগুলি অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। এই সারি গানগুলি পূর্ববঙ্গে বরজের গান, পরিহাস সংগীত, জলসওয়াগীত প্রভৃতি নামে প্রচলিত। অদ্বৈত মল্লবর্মণ একসময় গ্রাম থেকে এই গানগুলি সংগ্রহ করেন এবং নবশক্তি পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন। উপন্যাসে বাইচের নৌকাকে দৌড়ের নাও বলা হয়েছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে এগুলি সারি গান নামে উল্লিখিত হয়েছে। উপন্যাসের রাঙা নাও অংশে নৌকা বাইচ উপলক্ষ্যে কিছু সারি গানের উল্লেখ রয়েছে, দৃষ্টান্তে—

'আকাঠ মান্দাইলের নাও,
ঝুনুর ঝুনুর করে নাও,
জিত্যা আইলাম রে

নাওয়ের গলুই পাইলাম না।।[২]

কিংবা অন্য একটি সারি গানে বলা হয়েছে—

'জৈষ্ঠি না আষাঢ় মাসে যমুনা উথলে গো,
যাইস না যমুনার জলে।
যমুনার ঘাটে যাইতে দেয়ায় করল আন্ধি।
পন্থহারা হইয়া আমরা কিষ্ণ বলে কান্দি।।
যমুনার ঘাটে যাইতে বাইরে-ঘরে জ্বালা।
বসন ধরিয়া টানে নন্দের ঘরের কালা'।।[৩]

সারি গানের বিষয় মূলত প্রেম হলেও দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনা অবলম্বনে এই গান রচিত হয়। উপরিউক্ত গানটিতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে লৌকিক জীবনের প্রেমের চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে।

অন্য একটি নৌকা থেকে ভেসে আসা সারি গানে রাধার বিপ্রলব্ধা অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—

'আম গাছে আম নাই ইটা কেনে মারো,
তোমায় আমায় দেখা নাই আঁখি কেনে ঠারো।।
তুমি আমি করলাম পিরীত কদম তলায় রইয়া,
শত্তুরবাদী পাড়াপড়শী তারা দিল কইয়া'।।[৪]

এই গানটির সঙ্গে ঝুমুর গানের ভাষা ও সুরের গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

লোকসংগীতের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য মুখে মুখে তাৎক্ষণিক গান রচনা। লোকসংস্কৃতির ভাষায় একে বলা হয় ইমপ্রমচ্যু (Impromptu)। উপন্যাসে উদয়তারাকে দেখে অন্য নৌকার শিল্পীরা সঙ্গে সঙ্গে সারি গান রচনা করেছেন—

'ঝিয়াবীর মাথায় লম্বা কেশ,
খোঁপা বান্ধে নানান বেশ,
খোঁপার উপর গুঞ্জরে ভোমরা।।
গাঙে আইলে আঞ্জন মাঞ্জন
বাড়িতে গেলে কেশের যতন,
ঝিয়ারী জানি কোন পিরীতের মরা।।[৫]

বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম বাংলার এইরকম বহু অমূল্য সম্পদ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। লোকসংগীতের ক্ষেত্রে একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। লোকায়ত জীবন থেকে

অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া বহু সম্পদের কোনো নমুনা আমাদের সংগ্রহে নেই। সংক্ষিপ্ত পরিসরে কয়েকটি অবলুপ্তপ্রায় লোকসংগীতের পরিচয় এই নিবন্ধে উল্লিখিত হলো।

প্রসঙ্গ নির্দেশ

১। প্রসঙ্গ লোকসংস্কৃতি : মিলনকান্তি বিশ্বাস। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা ৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০১৪, 'দক্ষিণ বঙ্গের লোকজীবনে ঢেঁকি' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

২। তিতাস একটি নদীর নাম : অদ্বৈত মল্লবর্মণ, পুথিঘর, কলকাতা ৭০০ ০০৬, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬৩, সপ্তদশ প্রকাশ কার্তিক ১৪১০, পৃ-২৮৩।

৩। পূর্বোক্ত, তিতাস একটি নদীর নাম, পৃ-২১০

৪। পূর্বোক্ত, তিতাস একটি নদীর নাম, পৃ-২১০

৫। পূর্বোক্ত, তিতাস একটি নদীর নাম, পৃ-২১১

তথ্যদাতার পরিচয় :

১। শ্রীমতী গীতারানি মণ্ডল, বয়স-৭০, পেশায়-গৃহবধূ, ধর্ম-হিন্দু। ঠিকানা—গ্রামঃপো: সোনাখালী, থানা: বাসন্তী, জেলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তথ্যগ্রহণের তারিখ: ১১-১২-২০২২।